আল্লামা শিবলি নুমানি

রুমির জীবন ও দর্শন

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে রুমির বহুমাত্রিক অভিযাত্রা

আল্লামা শিবলি নুমানি

রুমির জীবন ও দর্শন

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে রুমির বহুমাত্রিক অভিযাত্রা

ভাষান্তর
কামরুল হাসান নকীব

প্রকাশন

অনুবাদকের নজরানা

সুফি সিলসিলার দেওবন্দি ঐতিহ্যের অনুসারী আমার
সকল উস্তাদদের পূণ্যহাতে; যাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

এবং

আমার মরহুমা নানির মাগফেরাত কামনায়; খোদার
জিকিরে যার *ওয়াজদ* ও ভাবাচ্ছন্নতা আমার শিশুমনকে
আলোড়িত করেছিল।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	৭-৮
পূর্বালাপ	৯-১০
প্রথম অধ্যায়	
জীবনী	১১-৬৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রচনাবলি	৬৯-১২৩
তৃতীয় অধ্যায়	
ইলুমল কালাম	১২৩-২০৪
চতুর্থ অধ্যায়	
দর্শন ও বিজ্ঞান	২০৫-২১২

অনুবাদকের কথা

সুফি ঐতিহ্য ও ঔচিত্যকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের নিখুঁত ইতিহাস রচনা করা মোটেই সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের সঠিক ইতিহাস চর্চার জন্য সুফি ঐতিহ্যকে বোঝা খুবই জরুরি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বাংলা ভাষায় সুফি ঐতিহ্য বা তাসাওউফের ইতিহাসকে বোঝার প্রচেষ্টা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অপ্রতুল।

বাংলা ভাষায় সুফি ঐতিহ্যকে বোঝার প্রভাবশালী প্রবণতাটি হলো, সুফিবাদকে ইসলামের (অবশ্যই পশ্চিম কর্তৃক আরোপিত ইসলাম) বাইরের কোনো সুকুমারচর্চা হিসেবে দেখা। শরিয়া-পরিচালিত ইসলাম ও সুফি-ইসলামের মাঝে বিস্তর ফারাক কল্পনা করতে এই ধারার লোকেরা বেশ সুখ বোধ করেন। আরেকটি প্রবণতার হদিস মেলে– যারা মনে করেন, সুফিবাদ চর্চা মানে অনৈসলামিক কাজ ও বে-শরা প্রেমচর্চা করা এবং তাসাওউফের সুদীর্ঘ পরম্পরায় কোন বিষয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার তোয়াক্কা না করে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতঅর্থে পরম্পরাহীনভাবে কোনো জ্ঞানকেই নিখুঁতভাবে ধারণ ও লালন করা যায় না।

বক্ষ্যমাণ অনুবাদখানা পাঠ করে এই দুই ধারার লোকেরা হয়তো কিছুটা হতচকিত হবেন। এর কারণ হলো, এই বইটি সুফি ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের গড়পড়তা পূর্বানুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং তাসাওউফ ও সুফি ভাবধারাকে মূলানুগভাবে তুলে ধরবে। আদতে সুফি ভাবধারা ও ইলমুল কালাম ভিন্ন কোনো গন্তব্যের অনুগামী নয়। ইলমুল কালামের কাজ হলো, ইসলামি শরিয়াকে ঘনিষ্ঠভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও বিধানাবলির সত্যতাকে নিরূপণ করা।

অন্যদিকে শিবলি নুমানি রহ. রুমির বরাতে প্রমাণ করেছেন–সুফি ভাবধারাও একই কাজ করে থাকে।

পার্থক্য শুধু এতটুকুই, ইলমুল কালাম প্রমাণভিত্তিক কাজ করে এবং সুফি ভাবধারা প্রয়োগভিত্তিক কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, ইলমুল কালাম নিছক ইসলামের সারসত্তাকে প্রমাণ করে এবং তাসাওউফ তাকে প্রয়োগ করে। মূলত এরা উভয়ই একই বস্তুকে প্রমাণ ও প্রয়োগ করে থাকে। তবে মনে রাখা দরকার, সুফিগণ তাদের প্রয়োগের পরিসরে প্রমাণকে সব সময় হাজির রাখেন। প্রমাণকে তারা কখনোই উপেক্ষা করেন না। আশা করি, বক্ষ্যমাণ বইটির ছত্রে ছত্রে এই দাবির সত্যতা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই বইটির আরেকটি অনন্য দিক হলো, রুমির বরাতে শিবলি নুমানি রহ. দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু দিক উন্মোচন করেছেন। শিবলি নুমানি রহ.-এর উপস্থাপনের দৃঢ়তা ও দক্ষতা দেখে পাঠকের মনে হবে–নুমানি চাইলেই রুমির বিজ্ঞান ও দর্শন জগৎ নিয়ে আরেকটি পুস্তিকা রচনা করতে পারতেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতেও নুমানি বেশ স্বচ্ছন্দ ও সজাগ ছিলেন। তবে মনে রাখা দরকার, বইটি তিনি রচনা করেছেন ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের সময়। সেসময়কার বিজ্ঞানজগৎ মোটেই এখনকার মতো উন্নত ছিল না।

অনুবাদ যথাসম্ভব সরল ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মাসনবি-এর কবিতার অনুবাদে আমরা কাব্যিক আবেদনের চেয়ে তাত্ত্বিক আবেদনের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলাম। তাই কোথাও কোথাও হয়তো মাসনবি-এর কবিতার কাব্যানুবাদ করা সম্ভব হয়নি। এটা মূলত কবিতার মূল বক্তব্যকে পাঠকের সামনে সহজভাবে উপস্থাপনের স্বার্থেই করা হয়েছে।

কামরুল হাসান নকীব
ভূঁইয়াপাড়া, খিলগাঁও

পূর্বালাপ

বক্ষ্যমাণ বইটি কালামশাস্ত্রের চতুর্থ কিস্তি। ইতঃপূর্বে কালামশাস্ত্র নিয়ে অধমের তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে– *ইলমুল কালাম, আল-কালাম* ও *আল-গাজালি* । মাওলানা রুমি রহ.-কে সবাই মূলত ফকিরি তথা দুনিয়াবিমুখতা ও তাসাওউফের সিলসিলার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবেই জানে। সে জন্য তাকে কালামবিদদের কাতারে শামিল করা এবং কালামবিদ হিসেবে তার জীবনচরিত রচনা করার বিষয়টি সবার জন্য নেহাত আশ্চর্যজনকই বটে। তবে আমি মনে করি, প্রকৃত 'ইলমুল কালাম' বা কালামশাস্ত্র মানে হলো, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসকে এমনভাবে বিচারবিশ্লেষণ করা এবং ইসলামের নিগূঢ় তাৎপর্য ও স্বরূপকে এমনভাবে তুলে ধরা ও চিত্রায়িত করা, যা খুব সাবলীলভাবে এবং অনায়াসে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। মাওলানা রুমি রহ. এই মহৎ কাজটি যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। তাই তাকে মুতাকাল্লিমদের কাতারে শামিল না করাটা নেহাত বে-ইনসাফি ও জুলুম হবে বৈকি।

মাওলানা রুমি রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত প্রচলিত ইতিহাসের বইগুলোতে বেশ সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হয়েছে। মাওলানার ঘনিষ্ঠ মুরিদ ও মহান

বুজুর্গ সিপাহসালার রহ. দীর্ঘকাল মাওলানার সোহবত-সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি মাওলানা রুমি রহ.-এর একটি জীবনী রচনা করেছেন। *মানাকিবুল আরিফিনে*ও রুমি রহ.-এর জীবন প্রসঙ্গে সুবিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুটি গ্রন্থকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি। কিন্তু এই গ্রন্থ দুটি প্রাচীন শৈলী ও বিন্যাসে রচিত হয়েছে বিধায় এতে উপকারী ও কার্যকরী তথ্য–উপাত্তের স্বল্পতা রয়েছে। মাওলানার রচনাকর্ম–বিশেষত *মাসনবি*-এর ওপর সবিশদ আলোচনা করে আমরা এই অসম্পূর্ণতা দূর করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

শিবলি নুমানি

প্রথম অধ্যায়

জীবনী

বংশ-পরিচয়, শৈশব ও শিক্ষা

মাওলানার নাম মুহাম্মাদ, উপাধি জালালুদ্দিন। তবে তিনি রুমের মাওলানা বা মাওলানা রুমি নামে সমধিক পরিচিত। বংশপরম্পরায় তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশধর। *জাওয়াহিরে মুজিআহ*-এ মাওলানার নসবনামা এরূপ বিবৃত হয়েছে–

> 'মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আহমাদ বিন কাসিম বিন মুসাইয়িব বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক।'

এই বর্ণনামতে, হুসাইন বলখি রহ. মাওলানা রুমির পরদাদা। কিন্তু সিপাহসালার তাকে রুমির দাদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই মতটিই সঠিক। হুসাইন রহ. অনেক বড় কামেল দরবেশ (সাহিবে হাল) ছিলেন। তার সময়ের রাজাবাদশারা তাকে বেশ সম্মান-সমীহ করতেন। মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ তার কাছে নিজ মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।[১] তার ঘরেই বাহাউদ্দিন রহ. জন্মগ্রহণ করেন। এদিক থেকে মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ[২] বাহাউদ্দিন রহ.-এর মামা[৩] এবং মাওলানা রুমির নানা।

---

১ *মদিনাতুল ইলম*, আরনিকি

২ মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ খাওয়ারিজিমি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একজন মহান বাদশাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। খোরাসান থেকে ইরান, কাশগর, মাওয়ারাউন্নাহার, ইরাক পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি তার আমলের শেষ দিকে সংকল্প করেন, আব্বাসি সালতানাতকে বিলুপ্ত করে সাদাতদের সালতানাত কায়েম করবেন। এই ইচ্ছায় তিনি বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন; কিন্তু রাস্তায় অতিরিক্ত বরফপাতের দরুন ফিরে আসেন। ৬১৬ হিজরি সনে চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গল সেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হন। এই পরাজয় নিয়েই তাকে ৬১৭ হিজরি সনে ইহলোক ত্যাগ করতে হয় (দেখুন, *তাজকিরায়ে দওলত শাহ সমরকন্দি*)...

৩ হজরত হুসাইন বলখি রহ.-এর কাছে যদি মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ তার

রুমি রহ.-এর বাবা শাইখ বাহাউদ্দিন রহ.

মাওলানার বাবার লকব বা উপাধি বাহাউদ্দিন। বলখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইলম, জ্ঞান ও মহৎ কর্মগুণে তিনি তার সময়ের এক বিস্ময়কর মনীষা ছিলেন। খোরাসানের দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা তার কাছে ফতোয়া তলব করতে আসত। বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মাসিক কিছু ভাতা পেতেন, তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে মোটেই অর্থ সাহায্য নিতেন না। তার নিত্যদিনের রুটিন ছিল, সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ছাত্রদের দরসি বা একাডেমিক শাস্ত্রাদি পাঠদান করতেন; জোহরের পর শরিয়তের আসরার ও হাকায়েক তথা গূঢ়তত্ত্ব ও বৌদ্ধিক তাৎপর্য বয়ান করতেন; সোমবার ও শুক্রবার জনসাধারণের উদ্দেশে নসিহত করতেন।

সময়টা তখন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সোনালি যুগ ছিল। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম মহান শাসক মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শাইখ বাহাউদ্দিনের ভক্ত ছিলেন, প্রায়ই তার মজলিসে যেতেন। সে সময় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহ.-ও বেশ পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহ তাকেও খুব পছন্দ করতেন। যখনই তিনি শাইখ বাহাউদ্দিন রহ.-এর মজলিসে যেতেন, ফখরুদ্দিন রাজি রহ.-কেও সাথে নিয়ে যেতেন। বাহাউদ্দিন রহ. তার ওয়াজের মাঝে মাঝে দর্শন ও দার্শনিকদের খুব নিন্দা করতেন এবং বলতেন, যারা আসমানি কিতাবাদিকে দূরে ঠেলে দিয়ে দার্শনিকদের জীর্ণশীর্ণ মতাদর্শের জন্য প্রাণোৎসর্গ করে

মেয়ে বিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে হুসাইন বলখির ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান (মাওলানা বাহাউদ্দিন রহ.) মুহাম্মাদ খাওয়ারিজম শাহর নাতি হওয়ার কথা। মামা কী করে হতে পারে? –অনুবাদক

দেয়, তারা কীরূপে নাজাতের আশা করতে পারে। ইমাম রাজি রহ. তার এসব কথা পছন্দ করতেন না; তবুও খাওয়ারিজম শাহর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেন না।

একদিন খাওয়ারিজম শাহ শাইখ বাহাউদ্দিনের কাছে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন হাজার হাজার মানুষের গণজমায়েত। রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যে যাদের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি এবং যাদের ডাকে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়, তাদের প্রতি রাজাদের অসন্তোষ সব সময়ই কাজ করে। খলিফা মামুনুর রশিদ এ কারণেই আলি রেজাকে ইদগাহে আসতে নিষেধ করেছিলেন। জাহাঙ্গিরও একই কারণে মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-কে বন্দি করেছিলেন।

যাই হোক, খাওয়ারিজম শাহ এত বিশাল গণজমায়েত দেখে ইমাম রাজি রহ.-কে লক্ষ্য করে বললেন, এ কোন আপদ শুরু হলো। ইমাম রাজি রহ. এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, যদি এখনই কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।' খাওয়ারিজম শাহ ইমাম রাজি রহ.-এর পরামর্শে শাহি কোষাগার ও কেল্লার চাবি বাহাউদ্দিন রহ.-এর কাছে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, 'সাম্রাজ্যের এই কয়টা চাবিই আমার দায়িত্বে আছে। সেগুলোও আমি আপনার খেদমতে পেশ করছি।' মাওলানা বাহাউদ্দিন রহ. তার ইশারা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি জুমার বয়ানের পর এখান থেকে চলে যাব।'

জুমার দিন শহর ত্যাগ করার জন্য বের হলেন। তার খাস ও ঘনিষ্ঠ মুরিদদের মধ্য হতে তিন শত বুজুর্গ ব্যক্তিও তার সাথে যুক্ত হলেন। খাওয়ারিজম শাহ যখন খবরটি জানতে পারলেন, বেশ অনুতপ্ত হলেন এবং তার কাছে গিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন।

কিন্তু মাওলানা বাহাউদ্দিন তার সংকল্পে অবিচল। রাস্তায় যেখানেই যাত্রাবিরতি করতেন, সেখানকার সকল নেতা ও আমিরগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে আসতেন।

৬২০ হিজরি সনে মাওলানা বাহাউদ্দিন নিশাপুরে পৌঁছুলেন। মহান সুফি ফরিদুদ্দিন আত্তার তার সাথে দেখা করতে আসেন। তখন মাওলানা রুমি রহ.-এর বয়স মাত্র ছয় বছর। কিন্তু সৌভাগ্য-তিলক তার ললাটে তখনো জ্বলজ্বল করছিল। রুমি রহ.-এর দিকে ইশারা করে আত্তার রহ. তার বাবা বাহাউদ্দিন রহ.-কে বললেন, 'এই বিরল রত্নটির যত্ন নিয়েন।' এরপর আত্তার রহ. তার মাসনবি *আসরার নামা* রুমি রহ.-কে উপহার দিলেন।[৪]

রুমের সুলতানগণ

মাওলানা রুমি রহ.-এর সাথে রুমের অধিকাংশ সুলতানদের বেশ সুসম্পর্ক ছিল। তাই তার জীবনবৃত্তান্তে রুমের সুলতানদের আলোচনা প্রায়শই চলে আসে। এ জন্য তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথাবার্তা বলে নেওয়া জরুরি। সে সময়ে যাদেরকে রুমের সুলতান বলা হতো, তারা মূলত সেলজুক রাজবংশের তৃতীয় শাখা ছিল, যারা এশিয়া মাইনর দখল করেছিল। তখন এশিয়া মাইনরকেই রুম বলা হতো। এই সালতানাত ২২০ বছর পর্যন্ত কায়েম ছিল। সব মিলিয়ে ১৪ জন সুলতান রাজত্ব করেন। এই সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান ছিলেন কুতালমিশ। তিনি তুগরুল বেগ সেলজুকির চাচাতো ভাই ছিলেন। কুতালমিশ আলপ আরসালানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ৪৫৬ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন।

৪ এ ঘটনাটি রুমি রহ.-এর প্রায় সকল জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সিপাহসালারের গ্রন্থে এটি কোথাও বিবৃত হয়নি।